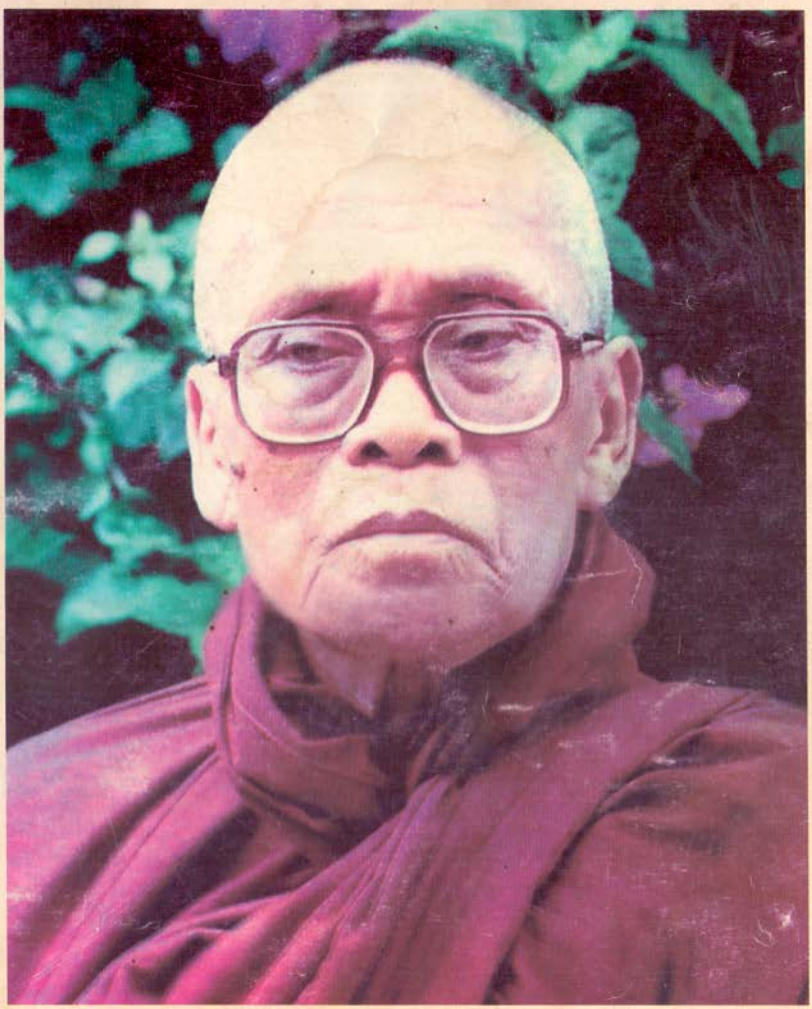

# ভিক্ষু কুলরবি
# রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের

# কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

**আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!**
**জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!**

This book is scanned by B Jyoti Bhante

প্রতি
সাধারণ সম্পাদক
শিশু করুণা সংঘ,
৩নং শম্ভুদাস লেন, (বৌবাজার)
কলকাতা-৭০০ ০১২

"ভিক্ষু কুলরবি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের" পুস্তিকাখানি নিলাম। আমি/আমরা অগ্রবংশ মেমোরিয়্যাল হল নির্মাণের জন্য নগদ/চেক .....টাকা দান করে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

নাম ঃ _____

_____

ঠিকানা ঃ _____

_____

_____

ফোন ঃ _____

_____

তাং _____ স্বাক্ষর

---

এই কার্ড উপরের ঠিকানায় ফেরৎ পাঠানর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সকলের দান ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়। শিশু করুণা সংঘ এর রসিদে দান গ্রহণ করলে দাতার আয়কর মওকুব হয়।

বোধিচরিয় প্রকাশনী-১

# ভিক্ষু কুলরবি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের

বিমল ভিক্ষু

**বোধিচরিয় সভা**
বোধিচরিয় বিহার, মৈত্রী নগর
নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০ ১৩৫
ভারত

প্রকাশক ঃ
শ্রী সুরকৃষ্ণ চাকমা
বোধিচরিয় বিহার, বোধিচিরিয় সভা
নিউ টাউন, রাজারহাট,
কলকাতা-৭০০ ১৩৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১) শিশু করুণা সংঘ
৩, শম্ভু দাস লেন
কলকাতা-৭০০০১২
ভারত।
২) সম্বোধি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
মাঝের বস্তি, তবল ছড়ী
রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ ঃ
৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০৮

মূল্য ঃ অগ্রবংশ মেমোরিয়্যাল হল নির্মাণ সাহায্য ১০০ টাকা।

মুদ্রণে ঃ
কণিকা প্রেস
৬৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

# উৎসর্গ

মানব উন্নয়নে
যাঁরা নিবেদিত প্রাণ
সেই মহান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে
এই ছোট্ট পুস্তিকাখানি
উৎসর্গ করলাম।

**বিমল ভিক্ষু**

# ভিক্ষু কুলরবি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের

উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্‌জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্‌মিং লোকে পরম্‌হি চ। (১৬৮)

উঠ, জাগো, ঘুমিয়ে থেকো না আর। সুচারুরূপে ধর্মাচরণ কর। যে অপ্রমত্তভাবে ধর্মাচরণ করে তার বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় কালই সুখের হয়।

রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর কণ্ঠে সেদিন শুনছিলাম গাথার মাধ্যমে এই প্রেরণা দায়ক আহ্বান। শুনতে শুনতে আমি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় অভিভূত হয়েছিলাম। বাহিরের কোন দিকে আর আমার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমার দেহে শিহরণ অনুভব করলাম। এরূপ ধর্ম দেশনা চাকমা ভাষায় আর কখনও শুনিনি। অনর্গল ধর্ম দেশনা করে যাচ্ছিলেন, মস্তক মুণ্ডিত, সুন্দর সুঠাম দেহ , গৌরবর্ণের বৌদ্ধ ভিক্ষু অগ্রবংশ মহাথের। গোলগাল মঙ্গোলিয়ান মুখাবয়ব। গায়ে পরিহিত সোনালী রং-এর গৈরিক বসন। বয়স তার হয়ত তখন ৫০ ছুঁই ছুঁই। সেদিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। সালটা পরিষ্কার মনে নেই। হয়ত : ১৯৬১ কি ৬২ হবে। শত শত লোকের ভিড়। সেই ভিড়ে আমিও মিশে গিয়েছিলাম। তখন আমার ছিল কিশোর বয়স। হতে পারে ১৩ কি ১৪। মুখে মুখে লোকে বলাবলি করছিল--মেলা বসেছে; বোয়ালখালীতে মাঘী পূর্ণিমা বুদ্ধ মেলা। জ্ঞানী গুনী ভিক্ষু এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে। কেহ এসেছেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় থেকে, কেহ এসেছেন রাঙ্গামাটি থেকে। আর কেহ বা এসেছেন কাচলং বা চেঙ্গী উপত্যকা থেকে। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম বোয়ালখালি দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারের কথা--যা পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যতম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার।

এ বিহারটি অবস্থিত নাতি উচ্চ ছায়াঘেরা পাহাড়ের উপর। আম, জাম, কাঁঠাল ও নারিকেল সহ হরেক রকমের ছোট বড় বৃক্ষ এই ছোট্ট পাহাড়টিকে আঁকড়ে রেখেছে মৈত্রী বন্ধনে। সকালে পাখীর কুজনে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর সন্ধ্যায় কিচির মিচির করে পাখীরা ফিরে আসে এই বৃক্ষ সমূহে। বিহারটির উত্তরে ছিল মাইনী উপত্যাকার চাকমা রাজার আঞ্চলিক অফিস। পূর্বে কল্লোলিনী মাইনী নদী বয়ে চলেছে কাচলং আর বড়গাংকে আলিঙ্গন করে সাগর সঙ্গমে। বিহারের অনতি দূরে চারিদিকে রয়েছে গ্রাম। রয়েছে সেই হাসিনসন পুর, কবাখালী, তারা বনিয়া, শান্তিপুর, বেতছড়ি ও ভৈরফা। আর সবচেয়ে কাছে বোয়ালখালী স্রোতস্বিনীর অপর পাড়ে বোয়ালখালী বাজার। এসব মিলে সেখানে গড়ে উঠে ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার এক অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ।

এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন সর্দ্ধমানিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির (বর্তমান উপ সংঘরাজ সর্দ্ধম জ্যোতিকা ধ্বজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির)। তার একনিষ্ঠ চেষ্টায় আয়োজিত হয়েছিল এই মহতি ধর্ম সভা। মন্দির সংলগ্ন পালিটোলের সম্মুখে তৈরী করা হয় ধর্ম মণ্ডপ। রঙ্গীন সামিয়ানা ও রং-বেরং এর পর্দায় সুসজ্জিত করা হয় এই ধর্ম মণ্ডপ। তাতে সৃষ্টি হয় ভাবগম্ভীর এক ধর্মীয় পরিবেশ। তা বেশ অপূর্ব লাগছিল।

স্টেজের উপর মেরুদণ্ড সোজা করে শান্ত সৌম্যভাবে বসেছিলেন ৩০/৩৫ জন ভিক্ষু। তাঁদেরই একজন হলেন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের। স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে চাকমা ভাষায় এমন সুমধুর কণ্ঠে ধর্মদেশনা করছিলেন যে, শত শত নর-নারী মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিলেন। সেই ভাষণে এলাকার মানুষের ধর্ম হৃদয় তন্ত্রী বেজে উঠেছিল। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এলাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা। সেদিন তাঁর ধর্ম ভাষণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মাইনী উপত্যকা। ভদন্ত অগ্রবংশ মহাথের জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়ে ছিলেন বুদ্ধের অমৃতময় নৈর্বাণিক বাণী গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-কন্দরে, গিরি-পর্বতে পৌঁছে দেওয়ার ।

**জন্ম :**

ভিক্ষু কুলরবি চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের পার্বত্য চট্টগ্রামের অহংকার, পার্বত্যবাসীর গর্ব। ২৩শে নভেম্বর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাইংখ্যং উপত্যকার বিলাই ছড়ি থানার কুতুবদিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা রুদ্রসিং কার্বারী (তঞ্চগ্যা) আর মাতা ইচ্ছাবতী তঞ্চগ্যা হলেন তাঁর গর্ভধারিণী। দয়া-দাক্ষিণ্যে, দানে শীলে, ধর্মে-কর্মে এই দম্পতি ছিলেন সবারই প্রিয়। সচ্ছল ছিল তাঁদের সংসার। কার্বারী হিসেবে প্রজা পালনে রুদ্রসিং তঞ্চগ্যার বেশ সুখ্যাতি ছিল । সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সব সময় প্রজাদের সাথে থাকতেন তিনি। এমনি ধার্মিক দম্পতির ঘরেই তো জন্ম দিতে পারেন মহাপুরুষ। শীলবান, মৈত্রী করুণাই অন্তর পরিপূর্ণ না হলে সৎ পুত্র জন্ম দেওয়া যায় না। তাই তো বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণের পূর্বে চিন্তা করেছিলেন কোন পরিবারে, কোন বংশে, কোথায় জন্ম নেবেন ? কেইবা হবেন তাঁর পিতা আর মাতাই বা হবেন কোন সতী স্বাধ্বী রমণী ? গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখলেন কপিল বস্তুর রাজা শুদ্ধোধন আর রাণী মহামায়া দানে-শীলে পরিপূর্ণ ধার্মিক দম্পতি আর শাক্য বংশই হল নিষ্কলংক। সেই বংশেই জন্মধারণ করেন সিদ্ধার্থ গৌতম। রুদ্রসিং কার্বারী (তঞ্চগ্যা) পরিবারেও ঠিক সেই ভাবে আর্বিভূত হন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের।

"দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বথ জায়তি,
যথ সো জায়তি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি (১৯৩)।"

"মহাপুরুষের আবির্ভাব অতীব দূর্লভ। এরূপ লোক সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। যেখানে এই মহাপূরুষের আর্বিভাব হয় সেই দেশ ও জাতি ধন্য হয়।"

রাজগুরু অগ্রবংশের আর্বিভাবে ধন্য রুদ্রসিং কার্বারীর বংশ। ধন্য অগ্রবংশের জন্মভুমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর মূখাবয়ব ছিল ফুটফুটে ফুলের ন্যায় সুন্দর। তাই এই শিশুর নাম রাখা হয় "ফুলনাথ"। ফুলনাথ তঞ্চগ্যা বাল্যকাল থেকেই ছিলেন শান্ত-শিষ্ট।

**বাল্যকাল :**

রাইংখ্যং উপত্যকার কুতুবদিয়া গ্রামের বিদ্যালয়েই বালক ফুলনাথ তঞ্চগ্যার হাতে খড়ি হয়। শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত ইন্দ্রমণি মাষ্টার। ছাত্র জীবনে মেধাবী ছাত্র হিসেবে বেশ খ্যাতি ছিল তাঁর। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে জীব জগতেরও। সেভাবে ফুলনাথের জীবনেও পরিবর্তন আসে, পরিবর্তন আসে তাঁর দেহ ও মনে। বসন্তের আগমণে ধরণী নব সাজে সজ্জিত হয়; বৃক্ষে বৃক্ষে দেখা যায় নব পল্লবের সমাহার। ফুল ফুটে, পাখী ডাকে আর দক্ষিণা সমীরণে সৃষ্টি হয় সে এক নতুন পরিবেশ। ফুলনাথও কিশোর থেকে পদার্পণ করে যৌবনে। তাঁর মনেও লেগে যায় বসন্তের হাওয়া। তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হন। পালন করতে থাকেন সংসার ধর্ম । সংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে তিনি লাভ করেন এক পুত্র ও এক কন্যা। এভাবে তিনি দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়েন মায়া আর মোহ বন্ধনে। মায়া আর মোহ বন্ধন সে তো দুঃখ।

জন্মই দুঃখ। জন্ম হলেই তো ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হবে, আত্মীয়-স্বজন পরিজনের সাথে সুখে-দুঃখে চলবে দিন। অবশেষে আসবে বৃদ্ধকাল। বৃদ্ধকাল অবাঞ্ছিত সকলের। কিন্তু না---নিস্তার নেই। বৃদ্ধকালের পরিণতি হল আত্মীয় পরিজন সহ এসুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া - যার নাম মৃত্যু। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা কতই না যন্ত্রণাদায়ক। অপ্রিয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ অস্বস্তিকর। কাংখিত বস্তুর অলাভ যেমন বেদনাদায়ক, অনাকাংখিত বস্তুর লাভও তেমনি বেদনা পূর্ণ। দঃখের সমষ্টিই হল এই দেহ । যাকে বলা হয় নাম-রূপ। নাম-রূপকে বুদ্ধ বলেছেন- পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধই দুঃখময়। পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু (জল ধাতু), তেজ ধাতু আর বায়ু ধাতু- এই চার মহাভূতের সমন্বয়ে গঠিত এই দেহ। এই দেহই হল "রূপ" স্কন্ধের অন্ত র্গত। আর বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, বেদনা এবং সংস্কার স্কন্ধ নিয়েই "নাম"। রূপ স্কন্ধ দেহকে নিয়ে ব্যক্তি থাকে সচেতন। বুদ্ধের ভাষায় এই সচেতনতাকে বলে "বিজ্ঞান"। চেতনা ছাড়া এ দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্প্রাণ। যদি দেহ একাগ্র চিত্তে কোনো কিছুর

দিকে তাকিয়ে দেখে তখন কানে শব্দ হলেও সে শুনবে না, কারণ সমস্ত-চেতনা চোখেই কেন্দ্রিভূত তার ।তখন কর্ণ ইন্দ্রিয়ে কোন চেতনা নেই। মনযোগ যখন চোখের মধ্যে নিবদ্ধ, তখন শুধু চোখে যা দেখছে তাই জানছে। শব্দের ব্যাপারে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

তারপরে মনের কাজ হল "সজ্ঞা"। কোন শব্দ কানে আসলে পূর্ব স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা শব্দটিকে বিচার করা হয়। এই শব্দটি প্রশংসা সূচক হলে ধরে নেওয়া হয় "ভাল" আর নিন্দা সূচক হলে ধরে নেওয়া হয় "মন্দ"।

মনের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ "বেদনা"। শব্দটি "ভাল" বা "মন্দ" বিচারের পরে শুরু হয় বেদনার কাজ। প্রশংসা সূচক হলে সমস্ত শরীরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। আর নিন্দা সূচক হলে মনে লাগে দুঃখ।

চতুর্থ পর্যায়ে মনের কাজ হল "সংস্কার"। সংস্কার মনকে প্রভাবিত করে। প্রশংসা সূচক শব্দে মনে আনন্দানুভূতি হয়, তাই সেই প্রশংসা শব্দ বারে বারে শুনতে ইচ্ছা করে। সেই ইচ্ছাকে বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় লোভ বা তৃষ্ণা। আর নিন্দা সূচক শব্দে মনে লাগে কষ্ট । এই শব্দের প্রতি বিরক্তি এসে যায়। বৌদ্ধ ধর্মে যাকে বলে দ্বেষ। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারে একই পদ্ধতিতে এইরূপ অনুভূতি জাগে। এই ক্ষণিকের আনন্দানুভূতি প্রবল তৃষ্ণায় পরিণত হতে পারে আর দুঃখানুভূতি বিরাট আকার ধারণ করে চরম ক্ষতি সাধন করতে পারে। এভাবেই মানুষের দুঃখ বেড়ে গিয়ে জটিল আকার ধারণ করে। পরিণতিতে মানুষ দুঃখের অকুল সাগরে হাবুডুবু খায়।

**প্রব্রজ্যা :**

এরূপে গভীর ভাবে ভেবে ফুলনাথ তঞ্চগ্যা দুঃখকে উপলব্ধি করেন। তার পরেই তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন-দুঃখ বর্দ্ধক সংসার আর নয়। দুঃখ মুক্তির পথ সন্ধানই হবে তাঁর কাজ। তাই তিনি চলে যান রাইংখ্যং বঙলতলী বিহারের অধ্যক্ষ উঃ তিস্‌স মহাস্থবিরের নিকট। ১৯৩৫ সালে এই বঙলতলী বিহারেই উঃ তিস্‌স মহাস্থবিরের নিকট প্রবজ্যা গ্রহণ করেন ফুলনাথ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী। লেখা পড়াতে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। প্রবজ্যা নেওয়ার পর তিনি চলে যান রাঙ্গুনীয়ার ধাতু চৈত্য বিহারে। সেখানে ছিল পালি ভাষায় ত্রিপিটক অধ্যয়নের সুব্যবস্থা। তখন সেই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন ভদন্ত ধর্মানন্দ মহাস্থবির। মহাস্থরির মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি পালির আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন ।

১৯৩৯ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমাকে বৌদ্ধরা বলেন "বুদ্ধ পূর্ণিমা"। বুদ্ধের জীবনের তিন তিনটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে এরূপ এক একটি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে। বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের জন্ম, বোধিজ্ঞান লাভ ও বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ হয় বৈশাখী পূর্ণিমাতে। তাই এই পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রমণ ফুলনাথ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রাইংখ্যং বঙলতলী বিহারে যান এবং গ্রহণ করেন ভিক্ষু উপসম্পদা। ভদন্ত উঃ তিস্‌স ছিলেন তাঁর উপসম্পদা উপাধ্যায়। উপসম্পন্ন ফুলনাথ শ্রমণ-এর নতুন নাম করণ হয় অগ্রবংশ ভিক্ষু।

সেই সময় চট্টগ্রামের বেতাগী বনাশ্রমে অবস্থান করেন বাংলাদেশের ভিক্ষুদের অন্যতম সাধক ত্রিপিটক বাগ্মীস্বর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের। জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি অখিল ভারত ভিক্ষসংঘের সংঘনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। উপসম্পদার কিছুদিন পরে ভিক্ষু অগ্রবংশ চলে যান বেতাগী বনাশ্রমে। তিনি পরিয়ত্তি (ত্রিপিটক অধ্যয়ন) ও প্রতিপত্তি (ধ্যান-ভাবনা) শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরর.নিকট। তাঁর আগ্রহ দেখে মহাথের মহোদয় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে অন্তে বাসী হিসেবে গ্রহণ করে ত্রিপিটক শিক্ষা দেন। পরে তাঁরা গুরু শিষ্য উভয়ে রাইংখ্যং কুতুবদিয়া গ্রামের অদূরে দুটি পাহাড়ের উপর দুজন ভাবনা অনুশীলন করার জন্য চলে যান।

ইতমধ্যে ভিক্ষু অগ্রবংশের ধর্মাচরণ ও সর্দ্ধমের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ জনমনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তাঁর প্রেরণা দায়ক ধর্ম দেশনায় কুতুবদিয়া গ্রামের যুব সমাজ ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে গঠিত হয় "কুতুবদিয়া বৌদ্ধ সমিতি"। এই সমিতির সদস্য ছিলেন কবিরত্ন কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চগ্যা, সহদেব মহাজন (তঞ্চগ্যা), হংসমণি কারবারী, বাঁশী মোহন দেওয়ান, যতন মণি চাকমা প্রমূখ যুবকগণ। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় বঙলতলী বৌদ্ধ বিহারে পূজা পার্বনাদি যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এই বিহারের এক কঠিন চীবর দানোৎসবে তদানিন্তন চাকমা রাজ ভদন্ত প্রিয়রত্ন মহাস্থবির (পালক ধন) ভন্তে-র যোগদানের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

**বার্মায় শিক্ষা জীবন :**

পরিয়ত্তি (ত্রিপিটক অধ্যয়ন) ও প্রতিপত্তি (ধ্যান-ভাবনা) শিক্ষায় তিনি যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন ততই বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রবল হচ্ছিল তাঁর মনে। তখন বঙ্গীয় বৌদ্ধদের ত্রিপিটক শিক্ষার তেমন বব্যস্থা ছিল না। অপর পক্ষে বংশ পরম্পরা বৌদ্ধধর্ম পালি ভাষায় অবিকৃত ভাবে পঠন-পাঠন ও অনুশীলন চলে আসছিল বর্মায় (মিয়ানমারে)।

ভিক্ষু অগ্রবংশ বুদ্ধের ধর্মকে সঠিক ভাবে জানার জন্য বার্মা যাওয়ার মনস্থ করেন। অবশেষে গুরুর আর্শীবাদ নিয়ে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপিটক অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। রেঙ্গুনে পৌঁছে তিনি অধ্যয়ন করেন ত্রিপিটক; শিক্ষা করেন বিদর্শন ভাবনা। তিনি রেঙ্গুনের "লেৎপেরাং বিশ্ববিদ্যালয়"-এবং "কামাইহেদো বিশ্ববিদ্যালয়"-এ পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে উচচ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভিক্ষু অগ্রবংশের উচচ শিক্ষার খবর পার্বত্য চট্টগ্রামে জ্ঞানানুরাগীদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। উচচ শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষু-শ্রমণদের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেন একজন আর্দশ বৌদ্ধ

ভিক্ষু। তাই তাঁর পদানুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক চাকমাও তঙ্গগ্যা ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষার জন্য বার্মায় যান। কিন্তু আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন ভিক্ষু-শ্রমণ তাঁর ন্যায় উচচ শিক্ষায় সফল হতে পারেন নি।

**সংগীতি কারক ভিক্ষু অগ্রবংশ :**

ভিক্ষু অগ্রবংশের রেঙ্গুনে অবস্থান কালে ১৯৫৪-৫৬ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতি। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভিক্ষু হিসেবে তিনি ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে যোগদানের নিমন্ত্রণ লাভ করেন। এই সংগীতিতে তিনি সক্রিয় ভাবে যোগদানও করেন। এটা কিন্তু পার্বত্যবাসীদের নিকট কম শ্লাঘার বিষয় নয়। বৌদ্ধ মহাসংগীতি কি তা জানার জন্য সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হল :

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভ হয় খৃ:পূ: ৫৪৭ অব্দে। তখন থেকে তিনি "বুদ্ধ" নামে খ্যাত হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। দেব-মানবের হিত সুখের জন্য শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতু উপেক্ষা করে তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্মপ্রচার করেন। বুদ্ধের অন্তিম উপদেশ ছিল-"হে আনন্দ! আমি যে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দিয়েছি আমার অবর্তমানে সেগুলি হবে তোমাদের শিক্ষক।" যতদিন ধর্ম-বিনয় থাকবে ততদিন বুদ্ধও থাকবেন। এই ধর্ম বিনয়কে বলা হয় "বুদ্ধ শাসন"। বুদ্ধ শাসনের স্থায়ীত্ব নির্ভর করবে ধর্ম-বিনয়ের অস্তিত্বের উপর। ধর্ম-বিনয় যদি এই পৃথিবী থেকে লোপ পায় বুদ্ধ শাসনেরও অস্তিত্ব থাকবে না। জগতে নেমে আসবে অবিদ্যা অন্ধকার।

বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ ধারা বাহিকভাবে চেষ্টা করে আসছেন বুদ্ধের "ধর্ম-বিনয়"কে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার জন্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে যুগে যুগে বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ বহু বাঁধার সম্মুখীন হন। কিন্তু সেই বাধার কাছে সংঘ কখনও নতি শিকার করেন নি। "ধর্ম-বিনয়" সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের জন্য যে সম্মেলন করা হয় তাকে বলা হয় "বৌদ্ধ মহাসংগীতি"। ধারা বাহিকভাবে রাজা-মহারাজা ও সার্বভৌম দেশের সরকার এই বৌদ্ধ মহাসংগীতির ব্যয়ভার বহণ করে থাকেন। বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন খৃ: পূ: ৫৪৪ অব্দে। এই খৃ: পূ: ৫৪৪ অব্দই বুদ্ধবর্ষ বা বুদ্ধাব্দ গণনার প্রথম বছর হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে ২৫৫২ বুদ্ধাব্দ (২০০৮ খৃ:)। ইতমধ্যেই ছয় ছয়টি থেরবাদ বৌদ্ধ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সব মহাসংগীতিতে ধর্ম-বিনয়ে অভিজ্ঞ শত শত ভিক্ষু একত্রিত হন। তাতে আবৃত্তি করা হয় "ধর্ম-বিনয়"। তা শুনে যেগুলি আসল ধর্ম-বিনয় সেগুলির কোন সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করা হয় না এবং সেগুলিই শুধু অনুমোদন করেন সংঘ। বুদ্ধ মহা পরিনির্বাণের সাত দিন পরেই বৃদ্ধ ভিক্ষু সুভদ্র ধর্ম-বিনয়ের প্রতি অবজ্ঞা সূচক উক্তি করেন। তজ্জন্য বুদ্ধ মহা পরিনির্বাণের তিন মাস পরেই ভদন্ত মহাকাশ্যপ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম

"বৌদ্ধ মহাসংগীতি"।

**প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি :**

স্থান : রাজগীরের সপ্তপর্ণী গুহা।

পরিচালনায় : ভদন্ত মহাকাশ্যপ।

সংগীতিকারক : পাঁচশত জন অর্হত।

বিনয় আবৃত্তি করেন : ভদন্ত উপালী থের।

সূত্র আবৃত্তি করেন : ভদন্ত আনন্দ থের।

স্থিতিকাল : সাত মাস।

পৃষ্ঠপোষক : মগধ রাজ অজাত শত্রু।

**দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি-খৃঃ পূঃ ৪৪৪ অব্দ (১০০ বুদ্ধাব্দ) :**

স্থান : বৈশালীর বালুকারাম।

পরিচালনায় : ভদন্ত যশ থের, ভদন্ত সব্বকামী থের ও ভদন্ত রেবত থের।

সংগীতিকারক : সাত শত জন অর্হত।

স্থিতিকাল : আট মাস।

পৃষ্ঠপোষক : মগধ রাজ কালাশোক।

**তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি-২৩৫ বুদ্ধাব্দ (খৃঃ পূঃ ৩০৯ অব্দ) :**

স্থান : পাটলী পুত্রের অশোকারাম।

পরিচালনায় : ভদন্ত মহামোগ্গলী পুত্র তিস্‌স থের।

সংগীতিকারক : এক হাজার জন অর্হত।

স্থিতিকাল : নয় মাস।

পৃষ্ঠপোষক : মগধ রাজ সিরি ধম্মাসোক।

**চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতি-৪৫০ বুদ্ধাব্দ (খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দ) :**

স্থান : শ্রীলংকার মালয় জেলা।

পরিচালনায় : ভদন্ত মহা ধম্মরক্‌খিত থের।

সংগীতিকারক : পাঁচশত জন ভিক্ষুসংঘ।

স্থিতিকাল : এক বছর।

পৃষ্ঠপোষক : মালয় জেলার জনগণের সহায়তায় সরকারের পক্ষে জেলাধিকারী এই বৌদ্ধ মহাসংগীতির সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। এই বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে সমস্ত ত্রিপিটক তাল পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

**পঞ্চম বৌদ্ধ মহাসংগীতি- ২৪১৫ বুদ্ধাব্দ (নভেম্বর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ) :**

স্থান : বার্মার (মিয়ানমার) মান্দালী। DAKKINARAM MONASTERY

পরিচালনায় : উঃ জাগরা ভিবংশ থের, ত্রিপিটকধর, মহাধম্মরাজাধি রাজগুরু।

সংগীতিকারক : ২,৪০০ শত জন ভিক্ষুসংঘ।

স্থিতিকাল : সাত বছর ছয় মাস চৌদ্দ দিন।

পৃষ্ঠপোষক : ব্রহ্মরাজ মিনডন।

সংঘের অনুমোদনের জন্য পাঁচ মাস তিন দিন ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ত্রিপিটক আবৃত্তি করা হয়। এই বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে সর্বপ্রথম সাত শত উনত্রিশটি মার্বল পাথরে খোদায় করে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করা হয়। এবং ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ কৃত এই পাথরগুলি মান্দালী হিলের পাদদেশে অবস্থিত লোকমারজিন পেগোডায় সংরক্ষণ করা হয়।

**ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতি- ২৪৯৮ বুদ্ধাব্দ (মে ১৯৫৪-৫৬ খৃষ্টাব্দ) :**

স্থান : ব্রহ্ম দেশের (মিয়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুন শহরের কাবায়ে মহাপাষাণ গুহা।

পরিচালনায়: U Nayung Yan Sayadaw Ven. Revata, Abhidhaja Maharatthaguru.

বার্মা, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, লাওস ও কম্বোডিয়া- এই পাঁচটি থেরবাদী বৌদ্ধ দেশের লোকেরা ধর্ম-বিনয় সম্পর্কীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অন্যান্য পঁচিশটি দেশ এই বৌদ্ধ মহাসংগীতি সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাহায্য করেন। এতে বার্মা সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই মহাসংগীতিতে শুধু ধর্ম-বিনয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি, এখানে ত্রিপিটকের টীকা টিপ্পনী সমূহও পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্জন ও গ্রহণ করা হয়।

এই ভাবে ভদন্ত মহা কাশ্যপ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ধারকবাহক ভিক্ষুসংঘ ছয় ছয়বার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ মহাসংগীতির আয়োজন করেন। তাই বুদ্ধর ধর্ম-বিনয় আজ অবধি অবিকৃতভাবে পরিশুদ্ধ রয়েছে। এই ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রতিনিধি হিসেবে ভিক্ষু অগ্রবংশ যোগদান করেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের নিয়ে এই বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে গঠন করা হয় "সুপ্রিম সংঘ কাউন্সিল"। সেই সংঘ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষু মহোদয়। তিনি ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে বার্মার "বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল" ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষুকে অগ্রমহাপণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত করেন। বার্মায় উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মহাসি স্যায়াডো উঃ শোভনা মহাথেরর সান্নিধ্যে থেকে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন। অতি অল্প সময়ে বিদর্শন ভাবনায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠে তিনি বিদর্শনাচার্য উপাধি লাভ করেন।

**চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায় এর সাথে সাক্ষাৎ :**

ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে যোগদান করার জন্য বার্মা সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বৌদ্ধ প্রতিনিধি হিসেবে মহামান্য চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায়কে আমন্ত্রণ জানান। তিনি পাকিস্তানে বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের নেতা হিসেবে রেঙ্গুনের ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে যোগদান করেন। সেই ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে সাক্ষাৎ হয় ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষু মহোদয়ের সাথে চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায়ের। আলাপ চারিতায় ধর্ম-বিনয়ে ভিক্ষু মহোদয়ের জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রাজা ত্রিদিপ রায়। ভিক্ষু অগ্রবংশের হাস্যময়ী বদন ও বিনম্র ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল চাকমা রাজাকে। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে দেশে ফিরে এসে রাজগুরু পদে আসীন হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায় সেই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশ ও পরিস্থিতি ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় অগ্রবংশ ভন্তেকে বর্ণনা করেন :

যুগে যুগে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলছে বাংলার বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে শাক্য বংশীয় চাকমা জাতি। চাকমা সমাজে বৌদ্ধধর্মের আলো কখনও একেবারে নিভে যায় নি। সত্যি কথা বলতে কি, বৌদ্ধধর্ম ও বৌর্দ্ধ সংস্কৃতি বংশ পরম্পরা আজ অবধি অনুশীলন করে চলেছে চাকমা জাতি। যুগের পরিবর্তনে ভিন্ন সম্প্রদায়ের শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন এমন কি গণহত্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগকে উপেক্ষা করে বৌদ্ধ ধর্মের আলোর শিখা এখনও জ্বলছে পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে; একেবারে নিভে যায়নি। তাই বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজ আগ্রহের সাথে জানতে ইচ্ছুক - কেমন আছেন পার্বত্য বৌদ্ধরা ? তাঁদের আচার ব্যাবহারে এখনও কতটুকু রয়েছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ? এক কথায় কেমন চলছে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ?

সুশিক্ষার অভাবে পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে নেমে এসেছে অবিদ্যা অন্ধকার। মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজ। বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা অর্চনায় মত্ত রয়েছে সমাজের মানুষ। আজ গাং পূজা, কাল শিব পূজা, পরশু হোইয়া পূজা এমন কি পার্বত্য বৌদ্ধরা প্রকৃতির পূজাও বাদ দিচ্ছেনা। সমাজে যে ক'জন বৌদ্ধ পুরোহিত লুরি বা লাউরী রয়েছেন শিক্ষার অভাবে ধর্ম-বিনয় তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। বিভিন্ন স্থান থেকে এসে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন, ধর্ম-বিনয় বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান সীমিত। তাই তাঁদের সুষ্ঠু ভাবে ধর্ম প্রচারের প্রশ্নই উঠে না। তা সত্ত্বেও পার্বত্যবাসী বৌদ্ধগণ ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় নি। তাঁদের রক্তে রক্তে, শিরাই-শিরাই বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের রীতি নীতি মিশিয়ে রয়েছে। ভূলে যেতে পারে নি বৌদ্ধ ধর্মকে; চ্যুত হয় নি তাঁরা সর্দ্ধম থেকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম এমনকি বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে চাকমা রাজ বংশের অবদান অপরিসীম। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের আলোর শিখা নিভু নিভু করে জ্বলছিল শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায়। পার্বত্য বৌদ্ধগণ যখন গাং পূজা ও অন্যান্য দেব-দেবী পূজায় মত্ত সেই সময়ে সমতলের বৌদ্ধগণ হিন্দু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় রত। কখনও বা লক্ষী-সরস্বতী, কখনও দুর্গা-শিব, আর কখনও বা মগধেশ্বরী ও চট্টেশ্বরী পূজা ছিল তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই সব পূজা পার্বণে পশুবলীর প্রচলন ছিল। সমতলে বৌদ্ধ সমাজে পুরোহিত হিসেবে যধরা লাউরী, থান লাউরী, চান লাউরীর নাম উল্লেখ রয়েছে। চট্টগ্রামে এখনও রাউলীর রাস্তা, রাউলীর হাট, রাউলীর ঘাট, রাউলীর দীঘি প্রভৃতি তদানিন্তন বৌদ্ধ পুরোহিতদের স্মৃতি বহন করে।

পূর্ব বাংলার বৌদ্ধধর্ম পূনরুত্থান, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রাতঃস্মরণীয়া পূণ্যশীলা চাকমা রাণী কালিন্দীর নাম সর্বাগ্রে। মহিয়সী কালিন্দী রাণী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর প্রধানা মহিষী। চাকমা রাণী কালিন্দী ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না, ধর্মভীরু, পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রজা হিতৈষীণী। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার দরুন পলাশী যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করে। তারই সাথে সাথে ভারতে পত্তন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের। কিন্ত তখনও চাকমা রাজা স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করেন। তারই পূর্বে চাকমা রাজা শেরমোস্ত খাঁর আমলে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ্যের সীমানা ছিল :

উত্তরে- ফেনী নদী।

দক্ষিণে- শংঙ্খ নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল।

পূর্বে- কুকী রাজ্য এবং

পশ্চিমে- নিজামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোগল আমলে চাকমা রাজা ফতে খাঁ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ১১ মণ কার্পাসের বিনিময়ে মোগল সাম্রাজ্যের ফারুকশাহ্-এর সাথে বাণিজ্যিক মৈত্রী চুক্তি করেন। এতে চাকমারা স্বাধীন জাতি হিসেবে মোগল সাম্রাজ্যের সাথে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। পরবর্তীতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হওয়ায় সেই কার্পাস শুল্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাই ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ বাহিনী চাকমা রাজ্য আক্রমণ করে। বৃটিশ বাহিনী কিন্তু বার বার যুদ্ধে পরাজিত হয়। যুদ্ধের রণ কৌশল হিসেবে অমানবিকভাবে বাণিজ্যিক অবরোধ সৃষ্টি করে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নুন, তেল ইত্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

সুদীর্ঘ বাণিজ্যক অবরোধ চলার পর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ৫০০ শত মণ কার্পাসের

বিনিময়ে চাকমা রাজা জানবক্স খাঁর সাথে বৃটিশ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেণ্ট হেষ্টিংস-এর এক বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। তারপর বৃটিশ সরকার ধীরে ধীরে চাকমা রাজার ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা করে। সেই থেকে চাকমা রাজ্য বৃটিশের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এই বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে ধীরে ধীরে চাকমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।

চাকমা রাণী কালিন্দীর (১৮৪৪- ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) শাসন আমলেও বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়নি। পুলিশ ফোর্স থেকে শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ রাণী কালিন্দীর হাতে ছিল। এমনকি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে Mr. Halhead, the Commissioner of Chittagong বলেন-- The Tribes were no British subjects but merely tributaries and that he recognized no rights of the British to interfere with their internal arrangement. ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। একমাত্র ডেপুটি কমিশনারই গভর্ণরের প্রতিনিধি ছিলেন। অন্য সকল কর্মচারী এমনকি পুলিশ ফোর্সও স্থানীয়ভাবে আদিবাসীদের থেকে নিযুক্ত করা হয়।

**বৌদ্ধধর্মে চাকমা রাণী কালিন্দীর অবদান :**

চাকমা রাণী কালিন্দী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তা সত্বেও তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করেন। হিন্দু ও মুসলিম প্রজাদের জন্য মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করে দিয়ে স্ব-স্বধর্ম পালনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজ প্রাসাদের সন্নিকটে বিদ্যমান ছিল বৌদ্ধ বিহার ।

কোন এক বিশেষ উপলক্ষে পূণ্যশীলা রাণী কালিন্দীর সাথে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির ও হারবাং-এর গুণমিজু ভিক্ষুর সাক্ষাৎ হয়। সেই দিন সারমেধ মহাস্থবির বুদ্ধের জীবন ও দর্শনের উপর এক সারগর্ভ দেশনা করেন। এই দেশনা শুনে রাণী কালিন্দী মুগ্ধ হন। পরে তিনি সারমেধ মহাস্থবিরকে তাঁর রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এবং সারমেধ মহাস্থবিরের নিকট তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়ে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের ধর্মাচরণে ও বিনীত ব্যবহারে চাকমা রাণী কালিন্দী এতই শ্রদ্ধা সম্পন্না হন যে, ১৮৫৭ খৃঃ "রাজ পূণ্যাহ্" উপলক্ষে মহাসমারোহে তাঁকে আরাকানী ভাষায় উপাধিযুক্ত সীলমোহর প্রদানের দ্বারা সম্মাননা জানান। এই সীল মোহর ইংরেজীতে অনুবাদ করলে তার অর্থ হয় এই-

"1219 A.E. The seal of Arakanese
Sangharaja and Vinayadhara"

তখন থেকে সারমেধ মহাস্থবির মহোদয় বাংলার বৌদ্ধদের কাছে সংঘরাজা হিসেবে

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উল্লেখ্য, সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামের হারবাং গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই অতিবাহিত হয় তাঁর বাল্য ও কিশোর জীবন। তাই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা তাঁর জানা ছিল। তজ্জন্য তিনি চাকমা ও বড়ুয়াদের সমাজে অবাধে বিচরণ করে সদ্ধর্ম দেশনার মাধ্যমে তান্ত্রিক মতের অসারতা এবং দেব-দেবী পূজায় পশুবলীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। যার ফলে বৌদ্ধ সমাজে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি পূজা প্রায়ই তিরোহিত হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পূণ্যশীলা রাণী কালিন্দী তাঁর রাজধানী রাজা নগরে নির্মাণ করেন শাক্যমুনি মন্দির। বুদ্ধ শাক্য বংশেরই সন্তান এবং চাকমাগণও শাক্য বংশাবতংশ বলেই নিজেদের দাবী করেন। সম্ভত: তাই তিনি এই বিহারের নাম রাখেন শাক্যমুনি মন্দির। প্রত্যেক বছরই বিঝু উপলক্ষে বৌদ্ধ মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই শাক্যমুনি মন্দিরে।

বাংলায় সদ্ধর্ম পুনরুত্থানে পূণ্যশীলা রাণী কালিন্দীর অবদান অপরিসীম। সেই সময় বাংলার বৌদ্ধ পুরোহিত রাউলীদের উপসম্পদা বিনয় সম্মত ভাবে হত না। কোন কোন রাউলী পুরোহিত চৌদ্দ-পনের বছর বয়সেও উপসম্পদা নিয়ে ভিক্ষু (থাগুর বা থাউর) হত। বিনয় সম্মত ভাবে উপসম্পদা নিতে হলে উপসম্পদা প্রার্থী শ্রমণের বয়স হতে হবে কমপক্ষে ২০ বছর। ভিক্ষুসংঘ শ্রমণকে উপসম্পদা প্রদান করবেন বিনয় সম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত পাষাণ সীমায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে প্রথম উপসম্পদার আয়োজন করেন মহামুনির পূর্ব পার্শ্বে হাঞ্চাওর ঘোণার এক পার্বত্য ছড়ায় (পার্বত্য স্রোতস্বিনী)। এই সীমা উদক (জল) সীমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সাত জন লাউরী পুরোহিত এই সীমায় থেরবাদ সম্মত উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

সদ্ধর্ম হিতৈষীণী রাণী কালিন্দীকে এই বিনয় সম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত **"ভিক্ষু সীমা"**র অভাবের ব্যাপারে অবগত করানো হলে তিনি সদ্ধর্মর নবজাগরণ আনার জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৮ই চৈত্র রাজা নগরের শাক্যমুনি মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে **ভিক্ষু সীমা** প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থরির, আচার্য গুনমিজু সহ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ভিক্ষুসংঘ। এই ভিক্ষু সীমা **"স্থল কুল রত্নাংকুর চিং"** নামে পরিচিত। এই "চিং" শব্দটি এখন চাকমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধগণ বিকৃতভাবে "গেং" বলে উচ্চারণ করেন। বলাবাহুল্য, এই "স্থলকুল রত্নাংকুর চিং"-ই বাংলাদেশের প্রথম বিনয় সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত **ভিক্ষু সীমা**। বাংলার প্রায়ই স্বনামধন্য কৃতি ভিক্ষু এই ভিক্ষু সীমায় উপসম্পদা লাভ করে সদ্ধর্ম প্রচার করেন। রাজানগর ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় সর্দ্ধমের পুনরুত্থান, সংরক্ষণ, এবং উন্নয়নের এক মহৎ পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন।

তিনি ছিলেন সদ্ধর্মের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। প্রজাদের সর্দ্ধম শিক্ষায় শিক্ষিত

করার জন্য "বৌদ্ধ রঞ্জিকা" নামক বুদ্ধের জীবনী সমন্বিত একটা পুস্তকও রচনা করার দায়িত্ব প্রদান করেন কবি নীল কমল দাসকে। কিন্তু তিনি হিন্দু হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল সীমিত। তাই তিনি বৌদ্ধ ধর্মে অভিজ্ঞ ফুলচন্দ্র বড়ুয়াকে (ফুলচন্দ্র লোথক নামে পরিচিত) বুদ্ধ রঞ্জিকা পুস্তকটি রচনার ভার দেন। এই বুদ্ধ রঞ্জিকা বইটি ১৮৫৭ খৃঃ ছাপা হয়। প্রজাদের ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ রঞ্জিকা পুস্ত ক মহাসমারোহে বিতরণ করা হয়। এই পুস্তক বিতরণ উপলক্ষে তিনি মহাদানের আয়োজন করেন। এই মহাদানানুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে গোলবদিনী হস্তী সহ ১৮টি হস্তী সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রা সহকারে রাজা নগর প্রদক্ষিণ করে চাকমা, মগ ও বড়ুয়া প্রজাদের কাছে এই পুস্তকটি বিতরণ করা হয়। এভাবে সদ্ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা **ইতিহাসে চাকমা রাণী কালিন্দীর এক অমর কীর্তি**। এতে বুদ্ধ ধর্মের প্রকৃত আলো সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে বর্তমান বৌদ্ধ ধর্ম চাকমা রাণী কালিন্দীরই অবদান। আজ সেই পূণ্যশীলা রাণী কালিন্দীও নেই, নেই সেই "ধর্ম-বিনয়" এ পারগূ সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরও। কালের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে শুধু সেই "গৌতম মুনি মন্দির" আর "স্থল কূল রত্নাংকুর চিং"।

সদ্ধর্ম চর্চার অভাবে অপসংস্কৃতিতে ছেয়ে যাচ্ছে সমাজ। অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ লুরী বা লাউরীদের দ্বারা হচ্ছে ধর্ম কর্মের কাজ। ধর্মের নামে হচ্ছে অধর্ম। ধর্মপ্রাণ মানুষ পূণ্য সঞ্চয়ের নামে করছে ধর্মকাম (শিব পূজা) মদ্যপান এই পূজারই অঙ্গ। ভিক্ষু-শ্রমণদের শিক্ষার জন্য পরিয়ত্তির (ত্রিপিটক অধ্যয়ন) ব্যবস্থা নেই। আছে শুধু আগর তারা বা বিকৃত পালি সূত্র। বুঝার তেমন কোন উপায় নেই। প্রত্যেক ধর্মের বিজ্ঞ ধর্মগুরুগণ দূরদৃষ্টি দিয়ে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করেন। গৃহীরা অবিদ্যাচ্ছন্ন। তারা থাকে মোহজালে আবদ্ধ। সমাজের ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা তাদের কাছে গৌণ। আত্ম পরিহিত-সাধনার্থ যে সব লোক ব্রতী হন, ধর্মের জন্য তারাই আত্ম নিবেদন করেন এবং তাঁরাই জ্ঞানালোকে সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করে থাকেন। তাই তাঁরা ধর্মোপদেশের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন সমাজের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা। সেই রকম জ্ঞানী-গুণী ভিক্ষুর অভাব পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে। সঠিক পথ নির্দেশনা দেওয়ার কেউ নেই। তাই চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায় অনুরোধ করেন ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষুকে "ফিরে আসুন মাতৃ ভূমিতে। রাজগুরুর পদে আসীন হয়ে জননী জন্মভূমির সেবা করুন। ধর্ম চক্ষু খুলে দিন মোহান্ধ মানুষের। তাঁরা দেখুক এই জগতের প্রকৃত রূপ আর সার্থক করুক এই দূর্লভ মানব জন্ম"।

**চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায়-এর আহ্বানে সাড়া :**

চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায়-এর আহ্বানে সাড়া দিলেন ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষু।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্ব মুহূর্তে কতই না চিন্তা উদিত হল তাঁর মনে। একদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ পুরোহিত-লাউরী, অন্যদিকে বহিরাগত গৈরিক বসনে আবৃত **ধর্ম-বিনয়** ও **শ্রদ্ধা** বিহীন ভিক্ষুদের সাথে লড়ে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা তাঁর সামনে সে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তারপরেই তিনি স্মরণ করেন বুদ্ধর বাণী :

অনুপূব্বেন মেধাবী থোকথোকং ক্ষণে ক্ষণে,
কম্মারো রজতস্সেব নিদ্ধমে মলমত্তনো (২৩৯)।

"স্বর্ণকার যেমন রূপার ময়লা দূর করে, সেরূপ বিজ্ঞজন আস্তে আস্তে-ক্ষণে ক্ষণে স্বীয় মল দূর করেন।"

সৎকাজ সম্পাদনে শত বাধা বিপত্তির সম্মূখীন হলেও অধৈর্য্য হতে নেই। বিন্দু বিন্দু জলেই যেমন কলস পরিপূর্ণ হয় তেমনি আস্তে ধীরে কাজ করেই সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে হবে, মোহ মুক্ত করতে হবে অবিদ্যাচ্ছন্ন সমাজের লোকদের। এ কাজ এক মুহূর্তে সম্পাদনের কাজ নয়, তা কষ্ট সাধ্য এবং চেষ্টা সাধ্য কিন্ত অসম্ভব নয়। এসব চিন্তায় দেশে ফিরে এসে উন্নয়ন কাজ করার আকাংখা তাঁর মনে আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও রাজগুরু পদে অভিষেক :**

১৯৫৬ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষু। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ বৌদ্ধ ইতিহাসে এক স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরই বুদ্ধর শাসন ২৫০০ বছর পূর্ণ হয়। এই বছরকে বৌদ্ধ ধর্মর নব জাগরণের বছর হিসেবে আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ ধর্মের যে ভাতা পড়ে আসছিল ১৯৫৬ সালে বুদ্ধ শাসনের ২৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপনের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুত্থান হয়। বুদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি জম্বুদীপেও (ভারতে) তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উদযাপিত হয়। এই ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সেই থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণের সূচনা হয়। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লক্ষ্য করেন কালের বিবর্তনের সাথে সাথে হয়েছে সব কিছুরই পরিবর্তন। পরিবর্তন হয়েছে সমাজ। পরিবর্তন হয়েছে মানুষের মন মানষিকতার এবং আচার-ব্যবহারের। এমন কি তাদের জীবন যাত্রারও। শুধু পরিবর্তন হয়নি বৌদ্ধ পুরোহিত লুরীদের (লাউরীদের) নিয়ম নীতির এবং তাদের ঘুনে ধরা পুরানো সেই প্রথার। সমাজে তখনও লুরী পুরোহিতরা ধর্মানুষ্ঠানের টাঙ্গোনের (বৌদ্ধ

ধ্বজা বা পতাকা) চাবড়া বাঁশের বেত দিয়ে বুনে। "ধর্ম কাম"এ (শিব পূজায়) মদ পান করে। কোন কোন লুরী পুরোহিত ক্যং এ (বিহারে) থাকে আর কোন কোন পুরোহিত থাকে তাঁদের আত্মীয় স্বজনের সাথে পরিবারে।

অগ্রবংশ মহাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায়-এর আহ্বানে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রাম ও বৌদ্ধ বিহার দর্শন করে পরিশেষে আসেন রাঙ্গামাটির চাকমা রাজ বিহারে। চাকমা রাজ বিহারের মূল মন্দিরটি গৌতম মুনি মন্দির নামে খ্যাত। রাঙ্গামাটি রাজ বিহারে অবস্থান শুরু হল ভদন্ত অগ্রবংশ ভিক্ষুর। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাগমনে এলাকাবাসী সবাই স্বাগত জানাল। রাজা ত্রিদিপ রায় খুশি হয়ে ভদন্ত অগ্রবংশ থেরকে রাজগুরু পদে বরণ করার আয়োজন করেন। ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে অগ্রবংশ থের যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায়, জাকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজগুরু পদে অভিষিক্ত হন।

রাজগুরু পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর শুরু হয় তাঁর ধর্ম সংস্কার ও ধর্ম প্রচারের কাজ। তিনি চিন্তা করেন তথাগত বুদ্ধ সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন হয়। বারানসীর ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র "যশ" সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা নিলে তাঁর ৫৪ জন গৃহী সাথীও বুদ্ধের নিকট গিয়ে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁরাও হন অর্হত। তখন জগতে অর্হতের সংখ্যা হয় ৬১ জন। নব লব্ধ নৈর্বানিক ধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে নির্দ্দেশ দেন - "হে ভিক্ষুগণ! দিকে দিকে বিচরণ কর, বহুজন হিতের জন্য, বহুজন সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেব-মানবের হিত সুখের জন্য, দুই জন এক পথে যেও না; হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ধর্ম দেশনা কর - যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পরিশেষে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, পরিপূর্ণ-পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত কর"। এই বলে বুদ্ধও উরুবেলার (বর্তমান বুদ্ধগয়ার) দিকে ধর্ম দেশনার জন্য যাত্রা করেন। এখানে বুদ্ধ সংঘকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

**ধর্ম ও সমাজ সংস্কার :**

ভদন্ত রাজগুরু অগ্রবংশ পার্বত্য চট্রগ্রামে ধর্ম সংস্কার ও সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষু সংঘের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি কুলপুত্রদের প্রব্রজ্যা দেওয়ার উপর সবিশেষ জোর দেন । তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধর্ম দেশনার মাধ্যমে কুলপুত্রদের ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কিছু সংখ্যক কুলপুত্র রাজগুরু অগ্রবংশ থেরর মুখে দান, শীল, ভাবনার কথা, দুঃখময় সংসার থেকে নৈস্ক্রমন্যের কথা, আত্ম ও পরহিতের কথা শুনে সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে ভিক্ষু সংঘ ছড়িয়ে পড়েন পাহাড়ে কন্দরে, গ্রামে গঞ্জে। তারা প্রচার করেন সদ্ধর্ম। এতে রাজগুরু ভন্তের মনোবল ও উৎসাহ

আরও দ্বিগুন বেড়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে সমাজ সংস্কার ও ধর্ম উন্নয়ন, এ দুটো কাজ এক সঙ্গে চলে। দান-শীল ভাবনা অনুশীলনে মানব জীবনে যেমন সুখ আসে তেমনি সমাজ জীবনে আসে সমৃদ্ধি। সমাজ জীবনে বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণা প্রতিফলন করার জন্য যেমন জোর দেওয়া হয় তেমনি তথাকথিত ধর্ম বিশ্বাসের নামে দেব দেবী পূজা ও পশুবলীর ন্যায় কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করারও জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়।

শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তে পার্বত্য বাসীকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৌদ্ধ বিহারগুলি একদিকে যেমন ধর্ম অনুশীলন কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অন্যদিকে এই বিহারগুলি পালন করে সমাজ উন্নয়নের বিশেষ ভূমিকা। এভাবেই পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে আসে নব জাগরণ। তখন সমাজে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তি মূলক শিক্ষা এমন কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষারও প্রসার ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যং বা বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এভাবে সমাজ ও ধর্ম উন্নয়ন, ছন্দ মিলিয়ে এক সাথে এগিয়ে চলে । ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নবজাগরণের জোয়ার আসার পেছনে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ ভন্তের অবদান অপরিসীম। বিহারকে কেন্দ্র করে আয়োজন হয় ধর্ম সভার । আলোচনা হয় ধর্ম ও সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত। এসব আলোচনা সভায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগদান করেন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা । আলোচনা সভায় মিলে তারা একে অপরের সাথে বিনিময় করে মৈত্রী ও শুভেচ্ছা। ফলে একের প্রতি অপরের জাগে ভ্রাতৃত্ববোধ। সমাজে আসে একতা ও সমৃদ্ধি ।

শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভান্তে সংঘ দান, অষ্টপরিষ্কার দান এবং কঠিন চীবর দানের ব্যাপক প্রচলন করেন। এতে দায়ক দায়িকাদের মধ্যে ধর্মচেতনাও বেড়ে যায়। এমনকি প্রবারণা মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামেগুলোতে বৌদ্ধ পার্বণাদি মহোৎসবের রূপ ধারণ করে ।

বর্ষ পরিক্রমায় প্রতি বছর ফিরে আসে শরত। তারই সাথে আগমন হয় প্রবারণা মাসের । বর্ষায় স্নাত প্রবারণা মাসে বড়গাং, কাচলং, চেঙেই ,মাইনী ইত্যাদি উপত্যকা নতুন সাজে সজ্জিত হয়। শরতের সোনালী রোদের পরশে আবহাওয়া হয় আরামদায়ক। এমনি সময় শিশির ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেটে চলে সোনালী রঙের চীবর পরিহিত ভিক্ষু সংঘ। এসব দৃশ্য মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগামের গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশ। তখন বিহারে বিহারে আয়োজন হয় কঠিন চীবর দানোৎসবের। দূর দূরান্ত থেকে আসে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। বহু দিনের পর

আত্মীয় পরিজনের পরস্পর মিলনে সৃষ্টি হয় সে এক আনন্দঘন পরিবেশ। তাতে ভিক্ষু কুলরবি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর আগমনে দায়ক দায়িকাদের মন হয় আরও আনন্দে উচ্ছ্বসিত আর কঠিন চীবর দানোৎসব হয় সাফল্য মণ্ডিত। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের পার্বত্য চট্টগামের জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন এমনভাবে দখল করে নিয়েছিলেন যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে পেলে আবালবৃদ্ধবনিতা উপাসক-উপাসিকাদেদের মন খুশীতে, আনন্দে নেচে উঠে। শ্রদ্ধা প্রদর্শন স্বরূপ বাদ্য বাজনা সহকারে জয় ধ্বণি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান দায়ক দায়িকাবৃন্দ। অভ্যর্থনার সেই জয় ধ্বনি আজও আমার কানে অনুরণিত হয়। তাঁর আগমনে শত শত কণ্ঠে ধ্বণিত হয়ে উঠে–

বন্দেতিরতনম।

বুদ্ধ কি ? জয়।

ধর্ম্ম কি ? জয়।

সংঘ কি ? জয়।

শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর কি ? জয়।

সদ্ধর্ম্ম প্রচারের মাধ্যমে দেশ মাতৃকার সেবায় নিজের জীবন আত্মোৎসর্গ করেন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের। সুখ সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তিনি গঠন করেন পার্বত্য চট্টগাম বৌদ্ধ সমিতি। সমাজের তরুণেরা এই সমিতির পতাকা তলে এসে ধর্মোন্নয়নের কাজে অংশ গ্রহণ করেন এবং ধর্মানুশীলনে অন্যকে উৎসাহিত করেন। তাঁরা পূর্ণিমা ও অমাবশ্যাতে উপাসক-উপাসিকাদের উপোসথ শীল পালনে উৎসাহিত করেন। বৌদ্ধ পার্বণাদি যেমন বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথি উদ্‌যাপনের জন্য উপাসক-উপাসিকাদের প্রেরণা দান করেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে গঠিত পার্বত্য চট্টল ভিক্ষু সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের ভিক্ষু সংঘকে বিনয় সম্মতভাবে জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করে দেন। সদ্ধর্ম প্রচার কার্য পরিচানায় এই সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফলে, শীলবান ভিক্ষু সংঘ , সাধু সজ্জনের সেবা পূজায় পার্বত্য বৌদ্ধদের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। সপ্ত অপরিহানিয় ধর্মে তথাগত বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন, "যারা শীলবান ভিক্ষু সংঘকে চতুরপ্রত্যয় দান দিয়ে সেবা করে, সর্ববিধ সুখ সুবিধা দিয়ে তাঁদের রক্ষা করে, শীলবান ভিক্ষু সংঘ ও সাধু সজ্জনদের নিজের দেশে আনায়নের চিন্তা করে এবং যেসব সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব স্বদেশে অবস্থান করছেন তাঁদের নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করে দেয়, গার্হস্থ্য জীবনে তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি হয়, কখনও পরিহানি হয় না। এভাবে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম পালন সহ মঙ্গল সূত্রে বর্নিত "বিনয চ সুসিক্‌খিত",

বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য পার্বত্য বৌদ্ধদের উৎসাহিত করেন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের।

বিনয়ে সুশিক্ষিত হয়ে অর্জিত জ্ঞান হল সুসংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন সম্পর্কীত জ্ঞান। প্রতিটি দেশের ও জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন খাওয়া দাওয়া, হাটা চলা, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ,পরস্পরের সাথে দর্শনে শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি রীতি নীতির ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞান। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে একে অপরের সাথে দর্শনে শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে প্রথা রয়েছে তা অতীব সুন্দর। বৌদ্ধরা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধর প্রকৃতি এবং বোধি লাভের ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করেন। পারমী পূরণের মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব। তাই শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় করজোড়ের মাধ্যমে পদ্ম ফুলের কুড়ি তৈরী করে তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আর তার তাৎপর্য হচ্ছে"এই পদ্মটি তোমায় দিলাম, হে ভবিষ্যত বুদ্ধ"। দৈনন্দিন জীবনে এই অভ্যাস অনুশীলনের ফলে মানুষের জীবনে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। স্বভাব হয় ভদ্র, নম্র। তারই ফলে অর্জিত হয় প্রচুর ক্ষমতা। তজ্জন্যই ধর্ম পদে উল্লেখ রয়েছে :

অভিবাদন সীলিস্‌স নিচ্চং বদ্ধাপচাযিনো
চত্তারো ধম্ম বড়ঢন্তি আযু বন্নো সুখং বলং (১০৯)

জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে যে সর্বদা অভিবাদন ও সম্মান করে তার আয়ু বর্ণ, সুখ এবং বল এই চতুর্বিদ সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা, মাননীয় ব্যক্তিকে সম্মাননার মাধ্যমে সৎ প্রবৃত্তিগুলো ফুটে উঠে আর মন হয় পবিত্র। পরিশুদ্ধ মনের পবিত্রতা মানব জীবনকে করে সৌন্দর্যে ও সুখে বিমণ্ডিত। ফলে সে লাভ করে নৈতিক শক্তি এবং চিত্ত হয় প্রশান্তিতে পূর্ণ। প্রশান্ত চিত্তে অবস্থানকারী ব্যক্তিরই বর্ণ হয় সুন্দর; বৃদ্ধি পায় তার আয়ু। ধর্মানুশীলন ও চর্চার ফলে বিনয় সম্পর্কিত জ্ঞানেরও প্রসার ঘটে।

**মহাস্থবির বরণোৎসব :**

রাজগুরু অগ্রবংশ ভন্তের জীবনের ঘটনাবলী সম্পাদিত হয় রাজকীয়ভাবে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল রাজকীয় মর্যদায় আয়োজন করা হয় মহাস্থবির বরণোৎসব। পূর্বেই উল্লেখ করেছি মহিয়সী কালিন্দী রাণীর পৃষ্ঠপোষতায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম আজ বাংলাদেশে বিরাজমান। মহাস্থবির বরনোৎসবে সেই থেরবাদের ধারক ও বাহক হিসাবে দাবীদার সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় রাঙ্গামাটি রাজ বিহারে। এই সভায় যোগদান করেন শতাধিক ভিক্ষু সংঘ। মহামান্য সংঘরাজ অভয় তিষ্য মহাস্থবিরের পৌরহিত্যে রাজগুরু অগ্রবংশ ভন্তের ভিক্ষু জীবনের দ্বাবিংশতিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কুটনেতিকবৃন্দের উপস্থিতিতে

তাঁকে মহাথের পদে বরণ করা হয়। এই মহাথের বরণোৎসব আন্তর্জাতিকভাবে সম্পন্ন হয় রাঙ্গামাটি চাকমা রাজ বিহারে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। মহাস্থবির বরণোৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বরণ্য নেতা প্রয়াত কামিনী মোহন দেওয়ান (প্রাক্তন এম. এল. এ.) মহোদয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ক'জন বিশিষ্ট ভিক্ষু মৈত্রী ও করুণা চিত্তে বহুজন হিত সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাথের (বন ভন্তে) অন্যতম। ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর "কাপ্তাই বাঁধ" এর ফলে পার্বত্যবাসীদের জীবনে নেমে আসে এক বিরাট অভিশাপ। লক্ষাধিক লোক পিতৃ পুরুষের বাস্তু ভিটা ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়। সেই সময় ধন পাতার সাধক শ্রমণও উদ্বাস্তু হয়ে মাইনী উপত্যকার দীঘিনালায় চলে যান। অবস্থান করেন দীঘিনালা বন বিহারে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মে অভিজ্ঞ ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদা প্রদান করা হয় এই সাধক শ্রমণকে। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর উপাধ্যায়ত্বে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যদায় সুসম্পন্ন হয় এই উপসম্পদা অনুষ্ঠান। এই সাধক শ্রমণ নিরন্তর সাধনায় নিমগ্ন থাকতে পছন্দ করেন বলে উপসম্পদার পর তাঁর নামকরণ হয় সাধনানন্দ ভিক্ষু। তাই সাধনানন্দ ভিক্ষু রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর অন্যতম শিষ্য। তিনি সারা জীবন বন বিহারে অবস্থান করে আসছেন বিধায় লোকে তাঁকে "বন ভন্তে" সম্বোধন করে থাকেন।

**সাহিত্য চর্চা :**

শত ব্যস্ততার মধ্যেও রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর সাহিত্য চর্চা ভূলে যেতেন না। আহার নিদ্রা যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ঠিক তেমনি সাহিত্য চর্চাও তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অবিছেদ্য অঙ্গ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে বন্দনা ও ভাবনাদি কর্ম সম্পাদনের পর সুমধুর কণ্ঠে সূত্র আবৃত্তি করেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর কণ্ঠ এতই সুমধুর যে তাঁর সূত্র আবৃত্তি সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনে থাকে। দৈনিক এক ঘন্টা করে তিনি স্মৃতি সহকারে চংক্রমণ করেন। নিত্য কর্মাদি সম্পাদনের পর বসে পড়েন কাগজ, কলম আর বই নিয়ে। তিনি লিখে যাচ্ছেন আর লিখে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বিষয়ে লিখে সেই বড় বড় খাতা ফেলে রাখেন। ৫০টির মত পুস্তক তিনি লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে সমবায় বুদ্ধোপাসনা, বুদ্ধোপাসনা (লোক বিভাগ), বুদ্ধোপাসনা (লোকত্তর বিভাগ) ধ্যান বিষয়ক, চাকমা গিদেদি মঙ্গল সূত্র, পরিণাম (নাটক), শ্রামণের শিক্ষনীয়, মানব ধর্ম পঞ্চশীল, বুদ্ধ সামন্তিকা, বিশুদ্ধি মার্গ, গীতি মঞ্জরী, (চাকমা ও বাংলা) , প্রতিশোধ (নাটক) চাকমা কথাদি ধম্মপদ, Stop Genocide in Chittagong Hill Tracts ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি পালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ত্রিপিটক অনুবাদ করেন। তাঁর লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি

অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে । সেগুলো প্রকাশিত হলে পাঠক অমূল্য রত্ন হাতে পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

**বিদেশ, বিভূঁই প্রবাসে :**

সত্তর দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী উগ্র জাতীয়তাবাদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগনের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে পার্বত্যবাসী অবাঙ্গালী জনগণ তা মনে প্রাণে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলশ্রুতিতে পার্বত্যবাসীদের ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় কাল মেঘের ঘনঘটা। উগ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মুসলিম বাঙ্গালীদের এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। যার ফলে, নানা প্রলোভনে মুসলিম বাঙ্গালীরা তাদের পূর্ব পুরুষের বাস্তু ভিটা ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় এসে অনভ্যস্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধূলায় লুন্ঠিত হয় মানবাধিকার। মানবাধিকার লঙ্গনের বিভৎস দৃশ্য দেখে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর মন কেঁদে উঠে। তিনি বেদনা বিদুর চিত্ত নিয়ে ১৯৭৭ খৃঃ নিরুদ্দেশ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি থেকে রওয়ানা হন, চলে যান ভারতে । ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণ করে বুদ্ধের পদচারণার স্থান সমূহ দর্শন করেন। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি কামনায় বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থে গিয়ে বন্দনা, ধ্যান-ভাবনা ও প্রার্থণা করেন। অবশেষে তিনি ফিরে আসেন কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, কলকাতায় প্রথম বৌদ্ধ বিহার - যা ১৯০১ খৃঃ ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই আগে ১৮৯২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (The Bengal Buddhist Association)। এই সভা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার পরিচালনা করেন। অন্যদিকে ১৯২০ খৃঃ অনাগারিক ধর্মপাল কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় বৌদ্ধ বিহার, ধর্ম রাজিক ধাতু চৈত্য বিহার। কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর ন্যায় একজন প্রবীণ ও ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ মহাথেরকে পেয়ে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সদস্যগণ অত্যন্ত খুশী হন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা করে দেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরকে পেয়ে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার মাননীয় সাধারণ সম্পাদক এবং অধ্যাপক ধর্মপাল মহাথের অত্যন্ত আনন্দিত। ধর্মপাল মহাথের এবং রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের মধ্যে বন্ধুত্ব অত্যন্ত হৃদ্যতা পূর্ণ। ধর্মপাল মহাথের সবসময় রাজগুরু ভন্তের সান্নিধ্য কামনা করেন। এমনকি খাওয়ার সময়ও রাজগুরু ভন্তেকে ফেলে খেতেন

না।

কলকাতার পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধ গ্রামের লোকেরা ধর্ম শুনার জন্য নিয়মিত শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তেকে ফাং (নিমন্ত্রণ) করেন। তাঁর ধর্ম ভাষণে কলকাতার বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ খুবই সন্তুষ্ট। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের পশ্চিমবঙ্গ বৌদ্ধদের অন্তরের শ্রদ্ধার আসন দখল করতে সক্ষম হন। কলকাতায় অবস্থানের সময় তিনি শুধু বৌদ্ধদের কাছে প্রিয় ছিলেন না, হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছেও সমান গুরুত্ব ছিল তাঁর । বিভিন্ন রাজ্য থেকে হিন্দু ধর্ম সভায়ও তাঁকে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানান হত। বৌদ্ধ ছাড়াও হিন্দু ভক্তের সংখ্যা কম ছিলনা তাঁর। বিভিন্ন সময় মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশে গিয়ে তাঁকে ধর্ম সভায় যোগদান করতে হত। ফলে ভারতবর্ষে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

**আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজগুরু অগ্রবংশ :**

রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর কর্মকাণ্ড শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি বিভিন্ন সম্মেলনে যাগদান করে পার্বত্য বৌদ্ধদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেন। ১৯৭৭ খৃঃ নেপালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে যাগদান করে তিনি পার্বত্য বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সবিস্তার বর্ণনা করেন। ১৯৮৫ খৃঃ আগষ্ট মাসে United Natitons Economic and Social Council Commission on Human Rights এর আমন্ত্রনে Sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities জেনেভায় অনুষ্ঠিত Working Group of Indigenous population এর সম্মেলনে যাগদান করে পার্বত্যবাসীদের উপর অমানবিক অত্যাচার ও নিপীড়নের বর্ণনা দেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানান।

১৯৮৬ খৃঃ নেদারল্যাণ্ড এর আমাষ্টারডাম শহর ভিত্তিক Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campign আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর এক সেমিনার হয়। তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের মহোদয়কে । ১৯৮৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে শ্রী সুরকৃষ্ণ চাকমা সহ তাঁরা নেদারল্যাণ্ড এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আমাষ্টারডাম শহরের পথে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট শহরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্রগণ অমানবিক অত্যাচার ও নিপীড়ণ থেকে বাঁচার জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বক্তব্য রাখেন। পরের দিন নেদারল্যাণ্ড এর আমাষ্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যোগদান করে পার্বত্য

চট্টগ্রামে অমানবিক অত্যাচার বন্ধ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তাঁরা বৃটেনের লণ্ডন, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে গিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রচার চালান। এভাবে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর কর্মক্ষেত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করে। তাই তাঁর পরিচিতি লাভ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসাবে। এশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের মাধ্যমে তিনি তথাগত বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করে বিশ্ব শান্তি স্থাপনের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

**পণ্ডিত রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের :**

রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের ছিলেন একজন প্রবল জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি। তিনি সারা জীবন জ্ঞানের সাধনা করেছেন। পড়া, লেখা, ধর্ম দেশনা ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী। জ্ঞানের প্রতি তাঁর যে এত প্রবল অনুরাগ, তা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। পালি ভাষায় ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। বর্মা ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তা ছাড়া চাকমা, তঞ্চগ্যা, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজী ভাষা ছিল তাঁর জানা। বিশ্বের চলমান ঘটনাবলীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। তাই তিনি প্রত্যহ বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকার খুটিনাটি সব বিষয় পড়েন। ভাষা শেখার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ চোখে পড়ার মত। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ইংরেজী বই আগ্রহ সহকারে পড়েন। পালি ভাষার উপর ছিল তাঁর অসাধারণ দখল। তাঁর জ্ঞানের পরিধি অবগত হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ করলে তিনি কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনা করেন। গতানুগতিক সীমাবদ্ধ সিলেবাসে অধ্যাপনা তাঁর ভাল না লাগায় তিনি অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু পালি বিভাগের শিক্ষকেরা তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নি। মাঝে মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে গিয়ে পালি সাহিত্যের দূরূহ বিষয়ে শিক্ষকদের পরিষ্কার ধারণা দিয়ে আসেন। পালি সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরকে পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রত্যেক বছর পণ্ডিতি ভাতা দিয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর জীবন সায়াহ্নে ২০০৬ খৃঃ ? মায়ানমার সরকার তাঁকে অগ্গমহা সদ্ধম্ম জ্যোতিকা ধ্বজ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি বৌদ্ধ বিশ্বে এক বিরল সম্মান।

**সমাজ কর্মী অগ্রবংশ মহাথের :**

১৯৮৬ খৃঃ রাজনৈতিক অস্থিরতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে। গণতন্ত্রকে পদদলিত করে চলছিল সামরিক শাসন। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠির উপর চলে অমানবিক অত্যাচার, নিপীড়ণ, হত্যা ও লুঠতরাজ। তা থেকে রক্ষা

পায়নি মা বোন এমনকি অনাথ শিশুরাও । তখন আক্রান্ত হয় দীঘিনালার পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম। বাঁচার তাগিদে ষাট হাজার শরনার্থীর সাথে ভারতে পালিয় যায় এই অনাথ শিশুরাও। তাদের রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করে কলকাতার শিশু করুণা সংঘ। সংঘের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তখন রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের। সংঘের সভাপতিরূপে ত্রিপুরার শরনার্থী শিবিরে গিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন। যার ফলশ্রুতিতে এসব রাজ্যের বৌদ্ধদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য বেড়ে যায়। কলকাতার শিশু করুণা সংঘ সদস্যদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সমাজ উন্নয়ন কাজে প্রেরণা যোগাতেন শ্রদ্ধেয় মহাথের। ফলে ১৯৯০ খৃ: প্রতিষ্ঠিত হয় বোধিচরিয় বিদ্যালয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয় মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আর সমাজ উন্নয়নেও এই সংগঠন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

**ত্যাগী অগ্রবংশ মহাথের :**

সময়ের প্রবাহে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তের বয়স বেড়ে যায়। বয়স বেড়ে গেলে শরীরের ভার নিয়নত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই ১৯৯৪ খৃ: তিনি হঠাৎ একদিন পিছলে পড়ে ডান হাটুতে আক্রান্ত হন। এতে হাটুতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অস্ত্রোপচার একবারে সফল না হওয়ায় দু দুবার অস্ত্রোপচার করতে হয়। কিন্তু রাজগুরু ভন্তে কোন টাকা জমা রাখতেন না। তিনি যে টাকা দান পেতেন তা সব গরীব দঃখীদের দিয়ে দিতেন। নিজের জন্য তিনি কোনদিন কোন চিন্তাই করেননি। তিনি ছিলেন সত্যিকারের ত্যাগী ভিক্ষু। সারাটা জীবন করুণায় বশবর্তী হয়ে নিঃস্বার্থভাবে জনহিতকর কাজ করেছিলেন। যদিও ভন্তে কোন টাকা জমা রাখতেন না কিন্ত প্রয়োজনে ঠিক কাজ উদ্ধার হয়ে যেত। সেভাবে এবারও তাঁর চিকিৎসার কোন অসুবিধা হয়নি। কলকাতার শিশু করুণা সংঘ তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। আরোগ্য হওয়ার পরও তিনি ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করে সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

**বোধিচরিয় বিহারে অবস্থান :**

বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর জন্য সব সময় এক জন সেবকের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। আমি ১৯৯৩ থেকে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তেকে বোধিচরিয় বিহারে এসে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করে আসছিলাম। বোধিচরিয় বিহারে এসে অবস্থান করলে তাঁর সেবকের কোন অভাব হবে না। ভন্তেও ছোট ছোট শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। শিশুদের কাছে পেলে তাঁর মন প্রফুল্ল থাকবে। আর শিশুরাও ভন্তের

সানিধ্যে এসে ধর্মোপদেশ শুনে, ধর্মানুশীলন করে, তাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে। কিন্ত জনসংযোগের অসুবিধা শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তের বোধিচরিয় বিহারে এসে অবস্থান করার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি সহসা বৌদ্ধ ধর্মাংকুর বিহার থেকে বোধিচরিয় বিহারে আসার সম্মতি দিতে পারেন নি। বার বার আমার অনুরোধে ১৯৯৫ সালে তিনি বোধিচরিয় বিহারে চলে আসেন। তখন থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বোধিচরিয় বিহারে অবস্থান করেন।

**ফিরে এলেন জননী জন্মভুমির কোলে :**

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সব কিছুরই হয় পরিবর্তন। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। বাংলাদেশেও আসে পরিবর্তন। জনগণ ফিরে পায় গণতান্ত্রিক অধিকার। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

পার্বত্য বৌদ্ধদের প্রতি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর ছিল চিরদিন অপরিসীম মৈত্রী ও করুণা। তাদের হিত সুখের জন্য তিনি সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। জীবন সায়াহ্নে এসে পৌছেও তিনি তাদের কথা ভুলে যেতে পারেন নি। তাই তাঁর ইচ্ছা হল আবার ফিরে যেতে জননী জন্মভুমির কোলে। দু চোখে আবার তাঁর দেখার ইচ্ছা হল সেই পুরনো উপাসক-উপাসিকা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের।

এদিকে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর বিদেশে অবস্থান করায় পার্বত্য বৌদ্ধদের মনে তাঁর অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণ শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভন্তেকে এক নজর দেখার জন্য আন্তরিক কামনা করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বারে বারে শ্রদ্ধেয় মহাথেরকে তারা অনুরোধ জানান। তাদের সেই অনুরোধ উপেক্ষিত হয়নি। তাদের সেই অনুরোধে তিনি সাড়া দেন। তাদের মনোবাসনা পুরণের জন্য তিনি সুদীর্ঘ ২৪ বছর বিদেশে প্রবাসে অবস্থানের পর ১৮ই জানুয়ারী ২০০১ সালে স্বদেশের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলে প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরর নেতৃত্বে পার্বত্য বৌদ্ধ প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিয়ে যান পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ পরিচালিত ঢাকার শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে। পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে ১০ই ডিসেম্বর ঢাকার গীন রোডস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় ছাত্রাবাসে। পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের আর আমি (লেখক) ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে একরাত্রি যাপনের পর তিনি রাঙ্গামাটি অভিমুখে রওয়ানা হন। ইতমধ্যে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ৫ সদস্য বিশিষ্ট এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন

রাঙ্গামাটি রাজ বিহার, রাজ বন বিহার , আনন্দবিহার ও মৈত্রী বিহারের প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়াও সর্ব সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ প্রতিনিধিবৃন্দ একাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণ শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। ২০০১ সালে ১৯ শে জানুয়ারী ভিক্ষু সংঘ সমভিব্যাহারে রাঙ্গামাটি আনন্দ বিহারে এক জনসমাগম হয়। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর আগমনের অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিল এই গনজমায়েত। অবশেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাত ৮-২৫ মিনিটে সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের পদার্পন করেন রাঙ্গামাটি আনন্দ বিহারে। পদার্পণের সাথে সাথে জনতা তাঁকে আন্তরিক সাদর অভ্যর্থনা জানান।

**জীবন সায়াহ্নে আবার রাঙ্গামাটি রাজ বিহার :**

রাঙ্গামাটি আনন্দ বিহারে কিছুদিন অবস্থানের পর চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় তাঁর পিতার আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরকে ফাং (নিমত্রণ) করে রাজ বিহারে নিয়ে যান। সেই থেকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাঙ্গামাটি রাজ বিহারে অবস্থান করেন।

**পতন হল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের :**

জননী জন্মভুমির কোলে ফিরে আসার পর ২০০১ সালে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ-এর মহা সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরকে সংঘ নায়ক পদে বরণ করা হয়। রাঙ্গামাটি রাজ বিহারে সাত বছর অবস্থানের পর বিশ্বের অসংখ্য গুণগ্রাহী ও ভক্তবৃন্দকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ২০০৮ সালের ৫ই জানুয়ারী পরলোক গমন করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সংঘ নায়ক রাজগুরু ভদন্ত অগ্রবংশ মহাথের। আনিচ্চা বত সংখার ..... পতন হল আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের হল অবসান। এই নক্ষত্র পঠনে অপুরণীয় ক্ষতি হল আমাদের, পার্বত্য বৌদ্ধদের, গোটা বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের। এই ক্ষতি কখনও পুরণ হওয়ার নয়।

**উপসংহার :**

চলে গেলেন কল্যাণ মিত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাভিক্ষু সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের। সবার জন্য রেখে গেলেন সেই বাণী - উঠ, জাগো, ঘুমিয়ে থেকো না আর সুচারুভাবে সদ্ধর্ম আচরণ কর। কর মানসিক উৎকর্ষ সাধন। মানসিক উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন ব্যক্তির উন্নতি হয় না। ব্যক্তির উন্নতি ছাড়া সমাজের উন্নতি হয় না। রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর এই বাণী যদি পার্বত্য বৌদ্ধগণ অনুশীলন করতে পারি তবে তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হবে অন্যথায় মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ হবে আমাদের। মানুষকে

পালি ভাষায় "মনুস্স" বলা হয় । যেহেতু মানষিক উৎকর্ষ সাধনে সে সচেষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মে মানব উন্নয়ন মূলক কাজই সবচেয়ে মহৎ কাজ। বুদ্ধত্ব লাভের পর সুদীর্ঘ ৪৫ বছর করুণায় বিগলিত চিত্তে বুদ্ধও মানব উন্নয়নের কাজ করেছিলেন; মানব উন্নয়নের জন্য করেছিলেন নৈর্বানিক ধর্ম দেশনা। আমরা আশা রাখব, পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজ সদা জাগরিত থেকে মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট থাকবে। তবেই তো আমাদের সমাজে জন্ম নেবে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর ন্যায় কল্যাণ মিত্র, আবির্ভাব হবে নিবেদিত প্রাণ মহাপুরুষের। সমাজের এহেন ঘোর দুর্দিনে একমাত্র নিবেদিত প্রাণ মহাপুরুষই পার্বত্যবাসীদের শুনাতে পারেন মুক্তির বার্তা আর দেখাতে পারেন মুক্তির পথ।

***Reference :***


1. Monirul Hussain and Lipi Ghose, Religious Minorities in Soth Asia, New Delhi, 2002
2. U.Nyunt Maung, The Teachings of the Buddha, published by Ministry of Religious affairs, Yangon, 1997
3. Sukomal Chaudhuri, Contemporary Buddhism in Bagladesh, Kolkata 1982
4. Chakma, Niru K, Maitrey Banee, Parbatya Bouddha Sangha, Dhaka 1986
5. Thich Nhat Hanh, Present Moment Wonderful Moment, Berkeley, California, 1990
6. Narada, A manual of Buddhism, Taipei, 1995
7. Bimal Bhikkhu, In Quest of Peace, World Conference, Kolkata, 1993
8. Chittagong Hill Tracts Commission, Life is not ours Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, London, 1991
9. Goenka, S. N, The Discourse Summaries, Vipassana Research Institute,Igatpuri, 2007
10. গুপ্ত, মিহির, ধম্মপদ, রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি, ২০০৭
11. স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ, মহাবর্গ, কলকাতা, ১৯৩৭
12. দেওয়ান, বিরাজ মোহন, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি, ১৯৬৯
13. মহাস্থবির, ধর্মাধার, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
14. চাকমা, মুকুন্দ, রাজগুরু, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের স্মৃতিচারণ সভা কমিটি, দীঘিনালা, খাগড়া ছড়ি, ২০০৮
15. পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের, রাঙ্গামাটি, ২০০১
16. মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ, মানব ধর্ম পঞ্চশীল, রাঙ্গামাটি, ২০০৪

ভিক্ষু কুলরবি রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বোধিচরিয় বিহারে অগ্রবংশ মেমোরিয়াল হল নির্মাণের জন্য এক মহতি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করে আপনিও মহাপুণ্যের ভাগী হোন।